মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রম্ নিবেদিত

# ন্যায়দণ্ড

মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের প্রথম নিবেদন

# ন্যায়দণ্ড

কাহিনী। জরাসন্ধ প্রযোজনা। রাধাকৃষ্ণ শর্মা নিবেদক। সুধীরকুমার দাস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ মঙ্গল চক্রবর্তী

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ আলী আকবর খাঁ, আলোকচিত্র ঃ কানাই দে, শব্দ-গ্রহণ ঃ শিশির চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল ঘোষ, শিল্পনির্দেশনা ঃ সুনীল সরকার; প্রধান সম্পাদক ঃ অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদনা ঃ বিশ্বনাথ নায়ক ও দেবী গাঙ্গুলী, রূপসজ্জা ঃ শৈলেন গাঙ্গুলী, ব্যবস্থাপনা ঃ সোমেন বন্দ্যোপাধ্যায় (মামা), আবহসঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা ঃ সতোন চট্টোপাধ্যায় এবং প্রচার সচিব ঃ বি ঝা।

**চরিত্র রূপায়নে ঃ**

রাধামোহন ভট্টাচার্য, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, জহর রায়, রবীন মজুমদার, সদানন্দ, বীরেন, তরুণ মিত্র, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বিশু চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ঘোষ, সত্য চট্টোপাধ্যায়, কানু, অমর সিং, গোবিন্দ মল্লিক, বিশ্ব ও আশীষকুমার।

অরুন্ধতী দেবী, সবিতা বসু, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ, মঞ্জুলা সরকার, কুমারী কুমকুম, স্নিগ্ধা কর, পলিরানী, বুলবুল ও তন্দ্রা বর্মণ।

**সহকারী কলাকুশলী** ঃ—পরিচালনা ঃ অমর নাথ মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুনীল, আলোকচিত্রে ঃ মধু ভট্টাচার্য, শব্দগ্রহণে ঃ জগৎ রায় ও ধীরেন কুণ্ডু, শিল্পনির্দেশনা ঃ গুপি সেন, ব্যবস্থাপনা ঃ মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, নিতাই সিংহ ও গুঞ্জবীর গুরুং, সঙ্গীত ঃ শ্রীঅলোক, সম্পাদনা ঃ বিপ্লব রায়চৌধুরী এবং রূপসজ্জা ঃ গৌর দাস।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ**

গৌরগোপাল দে সরকার (সুহাসনয়নী স্মৃতি মন্দির), বিমল রুদ্র (এটর্নী), ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিমল মুখোপাধ্যায়, বীরেন বোস, অনিল গুপ্ত, কিশোরী মোহন দে, ননী দাস, গুরুপ্রসাদ দে (বিশু), কেষ্ট ধর, মনমোহন ট্যান্ডন ও রামনিবাস পাণ্ডে।

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত এবং রাধা ফিল্মস ও ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৃহীত।

**একমাত্র পরিবেশক ঃ গোল্ডউইন পিকচার্স**

# কাহিনী

পুলিশ-সুপার মেজর ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন মিঃ বি কে সান্যাল। এই জেলারই ভূতপূর্ব, বর্তমানে অবসর-প্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট সেসন জজ। সঙ্গে এসেছে বছর পাঁচেকের ফুটফুটে একটি মেয়ে। মিঃ সান্যাল এসেছিলেন আসামী শশাঙ্ক মণ্ড-লের খোঁজে। তদানীন্তন বিচারক মিঃ সান্যালের হুকুমেই ডাকাতি মামলার আসামী শশাঙ্কর জেল হয়েছিল পাঁচ বছর। মিঃ সান্যালের হিসেবমত আজ তার ছাড়া পাবার তারিখ। কিন্তু মিঃ সান্যাল হতাশ হলেন। জেলের আইনমত মেয়াদের রেমিশন পেয়ে শশাঙ্ক মণ্ডল বছর খানেক আগে ছাড়া পেয়ে গেছে।

কোথায় চলে গেছে, কেউ তা জানে না। মিঃ ব্যানার্জিকে তার খোঁজ নেবার অনুরোধ জানিয়ে মিঃ সান্যাল ফিরে গেলেন। বহুদিন পূর্বের একটি স্মৃতি বসন্ত সান্যালের মনে পড়ে। একদিন রাত্রে একটি বছর দুয়েকের বাচ্চা মেয়েকে কোলে করে একটি দরিদ্র-বধূ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। তার করুণ আবেদনে জানা গেল, যে ডাকাতির মামলাটি জজসাহেবের এজলাসে চলছে, তাতে তার স্বামী শশাঙ্ক মন্ডলকে বিনা দোষে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখা হয়েছে। জজ-সাহেব করুণা করলে তার স্বামী মুক্ত হতে পারে—নইলে এই বাচ্চাটিকে নিয়ে ভীষণ বিপদেই পড়তে হবে।

রাধার অনুরোধ রাখতে পারেননি মিঃ সান্যাল। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আইনের চোখে শশাঙ্ক দোষী সাব্যস্ত হল—মিঃ সান্যালের বিচারে পাঁচ বছরের জন্যে জেলে গেল শশাঙ্ক।

শশাঙ্ক জেলে গেল। রাধা বিষ খেয়ে মরল।

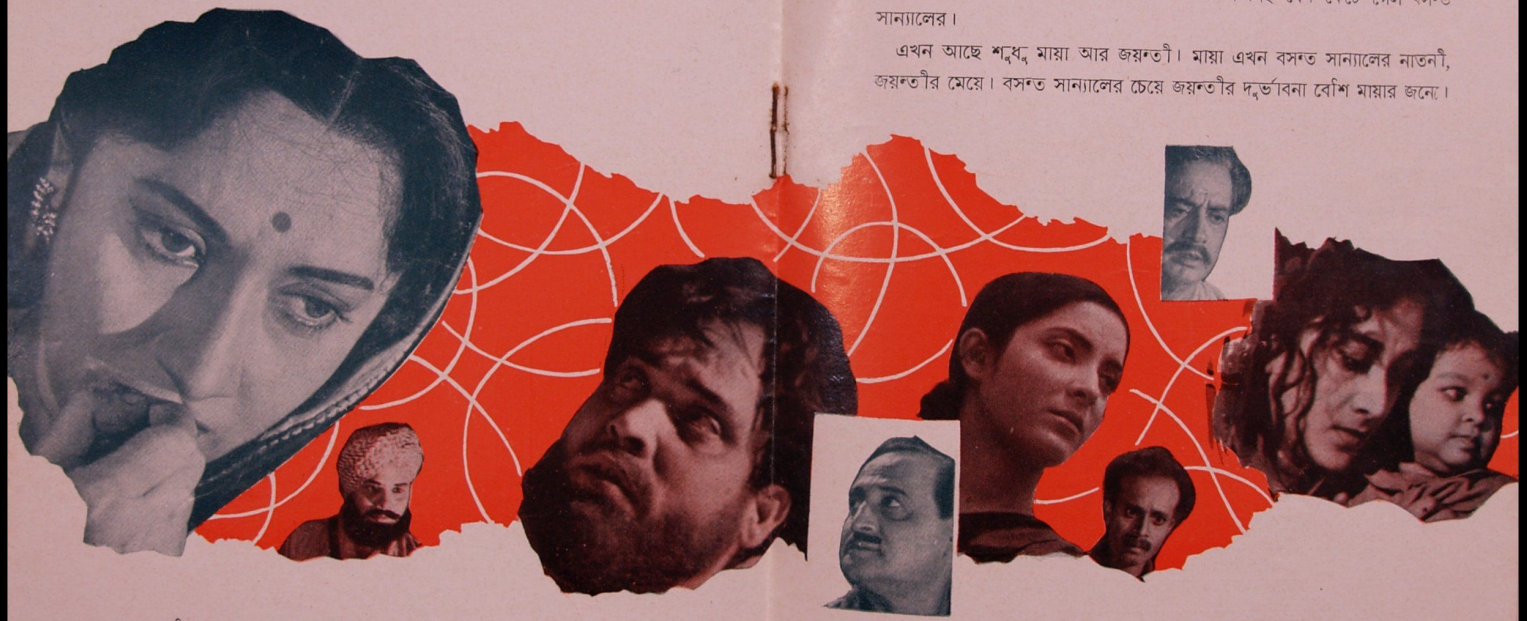





সনাতন নিয়ে এল শশাঙ্কর মা-মারা মেয়েটাকে জজসাহেবের কাছে। আশ্রয় দিলেন তিনি।

জেলে শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা করে বললেন, তোমার মেয়ে আমার কাছে রইল। তুমি ছাড়া পেলেই তোমার হাতে তুলে দেবো।

তারপর একদিন ঐ মেয়েটিকে নিয়ে বসন্ত সান্যাল চলে এলেন কলকাতায়।

স্ত্রী বীণাপাণি থেকে বাড়ির অন্যান্য সকলে ভাল মনে গ্রহণ করল না অনাথ শিশুটিকে। তাকে বিলিয়ে দেবার বা অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবার যখন বন্দোবস্ত চলছে, তখন মেয়েটাকে বুকে তুলে নিলেন বসন্ত সান্যালের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ জয়ন্তী। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলেন বসন্ত সান্যাল। তিনি দেও ঘরে চলে এলেন জয়ন্তী আর রাণীকে নিয়ে।

দেওঘরে পেঁৗছে জয়ন্তী যেভাবে মেয়েটিকে নিয়ে মেতে উঠল, তাতে বসন্ত সান্যাল নিশ্চিন্ত হলেন। জয়ন্তী যে মেয়েটির মা নয়—বাইরের লোক সে কথা টেরও পেল না। জয়ন্তী মেয়েটির নাম রাখল—মায়া।

এর মধ্যে একদিন অভিমানিনী বীণাপাণি মারা গেলেন। জয়ন্তীর স্বামী বিলেত গিয়ে আর ফেরেনি। ছোট ছেলে শঙ্কর এক মারাঠী মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। মেয়ে অনিমা বি এ পাস করে একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছে দিল্লী। সংসারের প্রতি সমস্ত বন্ধনই যেন কেটে গেল বসন্ত সান্যালের।

এখন আছে শুধু মায়া আর জয়ন্তী। মায়া এখন বসন্ত সান্যালের নাতনী, জয়ন্তীর মেয়ে। বসন্ত সান্যালের চেয়ে জয়ন্তীর দুর্ভাবনা বেশি মায়ার জন্যে।

মায়াও মা-কে না দেখে থাকতে পারে না একদন্ড। পারে না দাদুকে ছেড়েও থাকতে; আর বসন্ত সান্যালের পেশকার কাশীনাথ পাত্র তো মায়ার ছোটদাদু হয়েই বসে আছে। এদের সব কটিকে নিয়ে মায়া যেন এক স্বর্গরাজ্য রচনা করেছে।

কিন্তু যতই মায়ার বাঁধন বাড়ছে, ততই অস্থির হয়ে উঠছেন বসন্ত সান্যাল।

দিনটা ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। জয়ন্তীর বুক থেকে কেড়ে নিয়ে সঁপে দিয়ে আসতে হবে যার জিনিস তাকে।

সেদিনটাও এসে গেল। সত্যনিষ্ঠ বসন্ত সান্যাল তাঁর প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নিজেকে বোঝালেন আর বোঝালেন জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর কোন উপায়ই নেই—অসীম ধৈর্য আর সংযম রক্ষা করে মায়াকে তুলে দিলে সে শ্বশুরের হাতে।

মায়াকে নিয়ে এলেন জেলে—শশাঙ্কর হাতে তার মেয়েকে তুলে দেবার জন্যে। কিন্তু নিষ্ফল যাত্রায় আবার ফিরে গেলেন।

কোথায় পাবেন শশাঙ্ককে? শশাঙ্ক জেল থেকে বেরিয়ে অনেক খুঁজেছিল জজসাহেবকে—খুঁজেছিল তার রাণীকে—বিফল হয়ে কেবলি ঘুরেছে পথে পথে। এসেছিল কলকাতায়, সেখানেও খুঁজে পায়নি তার রাণীকে—না জজ-সাহেবকে। কিন্তু আর এক অপরাধে শশাঙ্কর আবার জেল হল।

শশাঙ্ককে না পেয়ে বসন্ত সান্যাল দেওঘরে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন জয়ন্তী একখানি চিঠি লিখে কোথায় চলে গেছে। মায়া মা-কে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল। জয়ন্তী তার বাপের বাড়ি থেকে ভাইকে সঙ্গে করে চলে গিয়েছিল দিল্লীতে অনিমার কাছে। সেখান থেকে চিঠি লিখলে। কিন্তু বসন্ত সান্যাল যে মায়াকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন, সে-কথা জয়ন্তীর চিঠির উত্তরে লিখলেন না। মায়ার কথা জয়ন্তী জানতে পারল না। মায়া জানল তার মা মামাবাড়ি গেছে।

কটা বছর কেটে গেল। কাশীনাথের সঙ্গে এলাহাবাদে এলেন বসন্ত সান্যাল। মায়া এখন বড় হয়ে উঠেছে। কলেজে পড়ছে। এক ধনী-সন্তান সুবিমলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। বসন্ত সান্যালের দিনগুলো বোধ-হয় ভাল যাচ্ছিল। শশাঙ্কর যখন খোঁজ পেলেন না; তখন এইভাবেই বোধ-হয় চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

আর এই সময় শশাঙ্ক তার মেয়াদ শেষ করে ছাড়া পেল। মিঃ ব্যানার্জি তখন বদলি হয়ে এসেছেন সেই জেলে। তিনি শশাঙ্ককে দেখে চিনতে পার-লেন। এতদিন একেই তো খুঁজছিলেন তিনি। একটি চিঠি লিখে শশাঙ্ককে পাঠিয়ে দিলেন এলাহাবাদ—বসন্ত সান্যালের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। দেখা হল। শশাঙ্কর হাতে তার মেয়েকে প্রত্যর্পণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বসন্ত সান্যাল।

বসন্ত সান্যাল এরপর ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবস্থা খারাপ বুঝে কাশীনাথ দিল্লী থেকে আনাল জয়ন্তীকে। জয়ন্তীর সঙ্গে এল অনিমাও। মেয়েকে নিতে যথাসময়েই এল শশাঙ্ক। মায়া গোপনে শুনলো তাদের কথা। ইতিমধ্যে সুবিমল, যাকে নিয়ে মনে মনে মায়া স্বপ্নের নীড় তৈরী করছিল, সেই সুবিমলকে তার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে তাকে সব কিছু ভুলতে বোললো। সুবিমল ও মায়ার কথাও শুনলো শশাঙ্ক বাইরে থেকে। সুবিমল চলে গেলে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকলো। বাপ মেয়েকে জড়িয়ে ধরে তার স্নেহের ঋণ বইয়ে দিলো; মেয়েও বাবাকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলো। তাদের এই মিলনে জয়ন্তীও পুলকিত হয়ে জানালো মায়াকে তার প্রকৃত বাবার কাছে পাঠাবে।

কিন্তু শশাঙ্কর মনের মধ্যে যেন কি এক পরিবর্তন হোলো। মায়াকে মিঃ সান্যালের পরিবারের একজন ভেবেই সে মায়াকে চিঠি লিখে জানালো যে তার পক্ষে সম্ভব নয় মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখের জীবন নষ্ট করা। জজসাহেব আর জয়ন্তী দেবীও যে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন মায়াকে লালন-পালন করে তার জন্যেও কৃতজ্ঞতা জানালো তাঁদের। চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়ে সে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ালো।

তারপর?

গোল্ডউইন
পিকচার্সের

**গর্বদীপ্ত**
**ঘোষণা**

প্রখ্যাত পরিচালক

# তপন সিংহের

অনবদ্য চলচ্চিত্র-সৃষ্টির
আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন

# আরোহী

॥ প্রস্তুতির পথে ॥

কাহিনী
**বনফুল**
সঙ্গীত
**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

প্রযোজনা
**অসীম পাল**

Printed by NEW Gaya Art Press Cal.-9